Times Today BD

ডেস্ক রিপোর্ট | মতামত | 06 May, 2025

জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা মানুষের চিরন্তন আকাঙ্ক্ষাগুলোর মধ্যে একটি।এ কারণেই অপরাধমুক্ত সমাজের প্রত্যাশা মানুষের জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক।কিন্তু অপ্রিয় হলেও সত্য, বাংলাদেশের মতো দেশে পরম আকাঙ্ক্ষিত অপরাধমুক্ত জীবন পাওয়া শুধুমাত্র দুরূহই নয়, বরং প্রায় অসম্ভব।এর একটি কারণ হলো মানুষের মধ্যে বিরাজমান অপরাধপ্রবণ মানসিকতা।

এই মানসিকতা হঠাৎ করে গড়ে ওঠে না।জন্মের পর থেকে বেড়ে ওঠার যে বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে, সেই সব পর্যায়ের অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশের সম্মিলনে মানুষের মানসিকতা গঠিত হয়।আর যখন এই মানসিকতা মানুষকে অপরাধ করতে প্ররোচিত করে, তখন সেই মানসিকতাকে আমরা অপরাধপ্রবণ মানসিকতা বলে থাকি।

আইনের ভাষায় এ বিষয়টি বোঝাতে 'মেন্স রিয়া' (□□□□ □□□) নামক একটি ল্যাটিন প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়, যা কোনো ব্যক্তির অপরাধ করার ক্ষেত্রে দোষপূর্ণ মানসিকতাকে নির্দেশ করে।কোনো ব্যক্তির ওপর শাস্তিমূলক দায় আরোপ করার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয়।

বাংলাদেশে ক্রমাগত অপরাধের ঊর্ধ্বগতি এবং অপরাধের বহুমাত্রিক উপস্থিতির কারণে অপরাধপ্রবণ মানসিকতার কারণ অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।সেই প্রেক্ষাপটে, এই প্রবন্ধে অপরাধপ্রবণ মন ও মানসিকতার আইনি ব্যাখ্যায় না গিয়ে অপরাধমূলক মানসিকতা গড়ে ওঠার পেছনের বিভিন্ন কারণ আগ্রহী পাঠকদের জন্য সংক্ষেপে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

শৈশবকালীন ট্রমা এবং পারিবারিক কাঠামোর প্রভাব

শৈশবে শিশুরা যদি পারিবারিক পরিসরে নানাবিধ শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন, অভাব-অনটন, পরিবারের কোনো সদস্যের মাদকাসক্তি, পরিবারের কারও কারাবন্দি থাকা কিংবা পিতামাতার বিচ্ছেদ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে, তাহলে তাদের মধ্যে শৈশবকালীন ট্রমা রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

এই ট্রমার প্রভাবে পরবর্তীতে তাদের মধ্যে অপরাধ করার মনোবৃত্তি দেখা দিতে পারে।শিশুরা সাধারণত অনুকরণপ্রিয় হওয়ায়, বড়দের অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের প্রভাব তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশ পায়।কোনো অপরাধ যদি নিয়মিতভাবে সংঘটিত হতে হয়, তাহলে তার জন্য যে অপরাধপ্রবণ মনোবৃত্তি প্রয়োজন, এই ধরনের পারিবারিক কাঠামো কিংবা শৈশবকালীন ট্রমা সেগুলো জাগিয়ে তুলতে পারে।

গবেষণায় দেখা যায়, নিরাপদ শৈশবের তুলনায় শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন কিংবা ট্রমার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠা ব্যক্তিরা পরবর্তীতে তুলনামূলকভাবে বেশি অপরাধপ্রবণ মানসিকতা ধারণ করে এবং অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা বেশি থাকে। এছাড়া, পারিবারিক সহিংসতা এবং অভিভাবকদের অবহেলা বা নিষ্ঠুরতাও শিশুদের দীর্ঘমেয়াদে অপরাধপ্রবণ করে তুলতে পারে।

সামাজিক পরিবেশের প্রভাব

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায়, শিশুকাল থেকে যে এলাকা বা সামাজিক পরিবেশে মানুষ বসবাস ও বিচরণ করে, সেই পরিবেশের প্রভাব তাদের মধ্যে অপরাধমূলক মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে।দরিদ্র এলাকা, বিশৃঙ্খল পরিবেশ, মাদকের সহজলভ্যতা, পতিত ভবনসমৃদ্ধ এলাকা এবং যেখানে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কম, সেই ধরনের এলাকায় বেড়ে ওঠা মানুষ তুলনামূলকভাবে বেশি অপরাধপ্রবণ হতে পারে।

যেসব এলাকায় বা পাড়া-মহল্লায় ভ্রাম্যমাণ লোকের আনাগোনা বেশি, সেখানে অপরাধপ্রবণতার হার তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। ভ্রাম্যমাণ মানুষের আনাগোনা বেশি থাকলে কোনো অপরাধ করে তা লুকিয়ে ফেলা সহজ হয় এবং অপরাধী খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ কারণে সেসব এলাকার সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মানুষের অপরাধমূলক মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।কাজেই, সেখানে বেড়ে ওঠা মানুষের মধ্যে অপরাধমূলক মানসিকতা তুলনামূলকভাবে বেশি তৈরি হতে পারে।

দরিদ্র এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ কম থাকায় তরুণ ও যুবকদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীতে সহিংস আচরণের জন্ম দেয়। তাছাড়া, সেখানে নিম্নবর্গের মানুষের সংখ্যা বেশি থাকায়, তারা নৈতিক কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে অধিক মাত্রায় উদাসীন থাকে।নৈতিকতার বিষয়ে এই উদাসীনতা তাদের অধিক মাত্রায় অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

গবেষণা থেকে প্রাপ্ত উপাত্তে দেখা যায়, শিশুকাল থেকে যে এলাকা বা সামাজিক পরিবেশে মানুষ বসবাস ও বিচরণ করে, সেই পরিবেশের প্রভাব তাদের মধ্যে অপরাধমূলক মানসিকতা গড়ে তুলতে পারে।

ফলে, তাদের অনেকেই মাদক ব্যবসা, চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি ও ভিক্ষাবৃত্তিসহ নানা ধরনের অনৈতিক কাজকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।এ ধরনের পরিবেশে অপেক্ষাকৃত কম সামাজিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় কিশোর অপরাধেরও বিস্তার ঘটে।আর একবার এ ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়লে, সেখান থেকে পরবর্তীতে বেরিয়ে আসা যথেষ্ট কঠিন হয়ে পড়ে।এদের অনেকেই পরিণত বয়সেও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড কিংবা পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকে।এভাবে, একটি অস্থিতিশীল সামাজিক পরিবেশ মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণ মন বা মানসিকতা তৈরি করে।

সঙ্গীদের প্রভাব

অপরাধমূলক মানসিকতা তৈরিতে মানুষের সঙ্গী বা পিয়ার গ্রুপের বড় ভূমিকা রয়েছে।যেহেতু মানুষের অপরাধমূলক আচরণ হঠাৎ করে তৈরি হয় না এবং এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক প্রক্রিয়ার ফল, কাজেই এই প্রক্রিয়ায় সঙ্গীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।সাধারণত মানুষ সমমনোভাবাপন্ন, সমমর্যাদাসম্পন্ন এবং অভিন্ন আগ্রহ সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলে।

এ ক্ষেত্রে তারা যে পরিবেশে বড় হচ্ছে, যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করছে, কিংবা ছোটবেলায় যাদের সাথে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করছে, সেই পরিমণ্ডল থেকেই সঙ্গী নির্ধারণ করে।এ সঙ্গীরাই তাদের মনন ও যুক্তিশীলতা তৈরি করতে সহায়তা করে।

এই পিয়ার গ্রুপ বা সঙ্গীরা যদি অপরাধপ্রবণ হয়, তাহলে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেড়ে যায়।বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে পরিচালিত বহু গবেষণায় দেখা গেছে, সহিংস আচরণ কিংবা অন্যান্য সম্পদকেন্দ্রিক অপরাধের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ সহচরদের প্রভাব অত্যন্ত প্রকট।

এ কারণে, মানুষ যাদের সাথে অধিক মাত্রায় মিশে, তারা যদি অপরাধমূলক মানসিকতা ধারণ করে, তাহলে সেই প্রভাব অন্যদের মধ্যেও

অপরাধমূলক মানসিকতা তৈরি করতে পারে।

ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মিডিয়ার প্রভাব

বর্তমান যুগে ডিজিটালাইজেশনের কারণে ইন্টারনেটের ব্যবহার বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে।মানুষ এখন তাদের প্রাত্যহিক জীবনের একটি বড় অংশ ভার্চুয়াল জগতে ব্যয় করছে।সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যথেচ্ছ ব্যবহার এবং অধিক মাত্রায় মোবাইল কিংবা কম্পিউটারের পর্দায় আটকে থাকার ফলে তাদের আচরণগত পরিবর্তন ঘটছে।

অতিরিক্ত সহিংস ও নৃশংস ঘটনা ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করায় মানুষের আনন্দ-বেদনার প্রতি সংবেদনশীলতা হ্রাস পেয়েছে।বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, ইন্টারনেট আসক্তির সাথে মানুষের নিষ্ঠুর বা সহিংস আচরণের শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে।

বিশেষ করে, গবেষণায় দেখা যায় যে, যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং অনলাইনে অধিক সময় ব্যয় করে, তারা তুলনামূলকভাবে বেশি সহিংস আচরণ প্রদর্শন করে।এছাড়া, অনলাইনে বিভিন্ন সহিংস ভিডিও গেম কিংবা ওয়েব সিরিজ দেখার মাধ্যমে তাদের মধ্যে অপরাধ সম্পর্কিত নানাবিধ ধারণা তৈরি হয়, যা তাদের বিভিন্ন অপরাধের দিকে ধাবিত করতে পারে।

সহিংস ওয়েব সিরিজ, আপত্তিকর নাটক বা চলচ্চিত্র, সহিংস ভিডিও কনটেন্ট এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত সংক্ষিপ্ত ভিডিও ক্লিপ মানুষের মধ্যে অপরাধমূলক মানসিকতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।পূর্ববর্তী সময়ে আকাশ সংস্কৃতি যে সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব তৈরি করেছিল, বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট সেটি বহু গুণ বাড়িয়ে তুলেছে।অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মানুষজন এতে বেশি ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে।

ইন্টারনেটে যেহেতু পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ সীমিত এবং নানা বিষয়ে মানুষের ব্যাপক আনাগোনার সুযোগ রয়েছে, তাই অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে কিংবা নিজস্বতা হারিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে উৎসাহিত হচ্ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কিংবা ইন্টারনেট একদিকে মানুষকে অন্যদের সাথে অধিক মাত্রায় সংযুক্ত রাখছে, অন্যদিকে কেউ যদি অপরাধমূলক মানসিকতা ধারণ করে, তবে সমমনোভাবাপন্ন অন্যদের সাথে যুক্ত হয়ে সে আরও বেশি অপরাধমূলক উপসংস্কৃতির মধ্যে প্রবেশ করছে।এতে করে তার অপরাধপ্রবণতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ অপরাধমূলক মানসিকতা গড়ে উঠছে।

অনলাইন কিংবা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সরাসরি অপরাধ সৃষ্টি না করলেও, এটি সহিংসতা ও অপরাধের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারে।ফলে মানুষের মধ্যে অপরাধমূলক মানসিকতা তৈরি হয়।

একাকিত্ব ও মানসিক বিচ্ছিন্নতা

বর্তমান সময়ে মানুষ পূর্ববর্তী সময়ের যৌথ পরিবারভিত্তিক সামাজিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে একক পরিবার গঠন করেছে।নারীদের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক পেশায় অন্তর্ভুক্তি পরিবার কাঠামোতে এক ধরনের একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে।

গবেষণায় দেখা যায়, দীর্ঘমেয়াদি একাকিত্ব মানুষের মধ্যে ক্রোধ এবং বৈরী মনোভাব তৈরি করতে পারে।এর ফলে তাদের মধ্যে নানা ধরনের সহিংস আচরণ প্রকাশ পেতে পারে, তারা অধিক মাত্রায় বিষণ্ন হয়ে পড়তে পারে এবং আত্মহত্যাসহ নানাবিধ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত হতে পারে।

বর্তমান সময়ে মানুষ পূর্ববর্তী সময়ের যৌথ পরিবারভিত্তিক সামাজিক কাঠামো থেকে বেরিয়ে একক পরিবার গঠন করেছে।নারীদের বিভিন্ন

আনুষ্ঠানিক পেশায় অন্তর্ভুক্তি পরিবার কাঠামোতে এক ধরনের একাকিত্ব এবং বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে।

তরুণ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই একাকিত্ব বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। বর্তমান সময়ে মানুষ যদিও অধিকাংশ সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করছে, তবুও তাদের মধ্যে মূলত 'ডিজিটাল একাকিত্ব' তৈরি হচ্ছে। 'ডিজিটাল একাকিত্ব' হলো এমন এক ধরনের একাকিত্ব, যেখানে মানুষ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেকের সাথে সংযুক্ত থাকলেও বাস্তবিক অর্থে এক ধরনের একাকিত্বের অনুভূতি বজায় থাকে।

মানুষ যখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অধিক মাত্রায় উপস্থিতির কারণে কোনো অর্থবহ সামাজিক সম্পর্কের বাইরে থাকে, তখন তাদের মধ্যে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতাবোধ তৈরি হয়।এই বিচ্ছিন্নতাবোধ তাদের মধ্যে নানাবিধ অপরাধমূলক মানসিকতার জন্ম দিতে পারে।

মানসিক ও স্নায়ুবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ

জিনগত এবং স্নায়ুবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন কারণেও মানুষের মধ্যে অপরাধমূলক মানসিকতা তৈরি হতে পারে। গবেষণায় দেখা যায়, মানুষের মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু অংশ, যেমন প্রিফ্রন্টাল কর্টেক্স, যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এটি মানুষের মধ্যে আগ্রাসী মনোভাব এবং অন্যান্য অপরাধমূলক মনোবৃত্তি তৈরি করতে পারে। এছাড়া, বিভিন্ন স্নায়বিক রোগের কারণে সৃষ্ট মানসিক এবং আবেগজনিত সমস্যা মানুষের মধ্যে সহিংস আচরণের সূচনা করতে পারে।

বিভিন্ন জিনগত বৈশিষ্ট্যও মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা জাগিয়ে তোলার জন্য দায়ী। এর বাইরেও, মানুষের বুদ্ধিভিত্তিক দুর্বলতা এবং আবেগজনিত অস্থিতিশীলতা মানুষের মধ্যে অপরাধমূলক মানসিকতা তৈরি করতে পারে।

উপসংহার

অপরাধপ্রবণ মন ও মানসিকতা আসলে বিভিন্ন সামাজিক, পারিপার্শ্বিক ও মানসিক প্রক্রিয়ার একটি সমন্বিত বহিঃপ্রকাশ।শৈশবকালীন ট্রমা কিংবা স্নেহপ্রাপ্তিতে ঘাটতি থেকে শুরু করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দারিদ্র্য, অনলাইন আসক্তি, একাকিত্ব এবং আরও অন্যান্য উপাদান মিলেই মানুষের অপরাধমূলক মন বা মানসিকতা তৈরি করে।

বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র একক উপাদান নয় বরং বিভিন্ন উপাদানের সমন্বিত প্রভাবেই মানুষের মধ্যে অপরাধমূলক মানসিকতা অধিক মাত্রায় তৈরি হয়।অপরাধ প্রতিরোধের ব্যবস্থাও তাই হতে হবে বহুমাত্রিক।

অপরাধমূলক মানসিকতা প্রতিরোধ করার জন্য জনসাধারণ যদিও কঠোর শাস্তির দাবি করে, মূলত শিশুদের নিরাপদ শৈশব নিশ্চিত করা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলার মাধ্যমে মানুষের অপরাধমূলক মানসিকতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

এছাড়া অনলাইন ও সামাজিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা, তরুণদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ তৈরি করা, ডিজিটাল একাকিত্ব দূর করা এবং মানসিক সহায়তা প্রদান করার মাধ্যমেও অপরাধপ্রবণ মন ও মানসিকতা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠনগুলো এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

অপরাধ বিশ্লেষণ

© 2025 TimesToday. All Rights Reserved.

Generated on 28 June, 2025 09:24

URL: https://www.timestodaybd.com/opinion/2018481760